ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1283- 1300
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.348

ব্রাহ্মসমাজে মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব ও ধর্মীয় রূপান্তর: রাজনারায়ণ বসু ও কেশব চন্দ্র সেনের চিন্তা ও কর্মের আলোকে একটি সমালোচনামূলক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

প্রতীক দুয়ারী, *গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 18.03.2026; Accepted: 19.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The nineteenth century in Bengal witnessed significant religious and social transformations under this context, the Brahmo movement emerged as an important reformist initiative aimed at revitalizing Indian religious thought and society. Initiated by Raja Rammohan Roy and later institutionalized by Debendranath Tagore, the Brahmo Samaj sought to promote monotheism, rational spirituality, and social reform. However, the movement also experienced ideological tensions and internal debates regarding the nature of religion, tradition, and reform.

This paper critically examines these ideological conflicts and religious transformations within the Brahmo Samaj, focusing primarily on the contributions of Rajnarayan Basu and Keshab Chandra Sen. Rajnarayan Basu emphasized the continuity of Brahmo ideals with the philosophical foundations of the Upanishads and the broader Hindu cultural tradition. Through his writings, lectures, and reformist activities, he attempted to restore confidence in indigenous cultural heritage while advocating a rational and ethical form of religion.

In contrast, Keshab Chandra Sen introduced a more universalistic and progressive interpretation of Brahmoism, incorporating elements of global religious thought and advocating wider social reforms. These differing approaches generated important debates within the Brahmo Samaj regarding the relationship between tradition and modernity.

By analyzing the ideas and activities of these two influential thinkers, the study highlights how ideological disagreements contributed to the transformation of the Brahmo movement. It argues that the dynamic tension between cultural rootedness and universal reform played a crucial role in shaping the intellectual and religious history of nineteenth-century Bengal.

Keywords: Brahmo Samaj, Rajnarayan Basu, Keshab Chandra Sen, Religious Reform, Colonial Bengal, Ideological Conflict

ঊনবিংশ শতকের ভারতীয় সমাজজীবন ছিল এক গভীর পরিবর্তন ও দ্বন্দ্বের যুগ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পাশাপাশি বৌদ্ধিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনেও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা, বিজ্ঞানচেতনা এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যকলাপ ভারতীয় সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুশীলনের সামনে এক নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল।[১] এই পরিস্থিতিতে একদিকে যেমন রক্ষণশীল সমাজ প্রচলিত ধর্মীয় আচারকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করছিল, অন্যদিকে নব্য শিক্ষিত

সমাজের একাংশ ভারতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন অনুভব করছিল। এই দ্বন্দ্বপূর্ণ পরিবেশেই উনিশ শতকের বাংলা সমাজে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের সূচনা ঘটে, যার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২]

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৮ সালে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা, পৌত্তলিকতার বিরোধিতা এবং যুক্তিনির্ভর ধর্মচিন্তার প্রসার। পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজকে সংগঠিত রূপ দেন এবং উপনিষদীয় বেদান্ত দর্শনের ভিত্তিতে ব্রাহ্মধর্মকে একটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শে উন্নীত করার চেষ্টা করেন।[৩] কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস কেবলমাত্র ধর্মীয় সংস্কারের ধারাবাহিকতা নয়; এর ভেতরে মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব, মতভেদ এবং পরিবর্তনের ধারাও সমানভাবে সক্রিয় ছিল।

এই মতাদর্শিক দ্বন্দ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় দেখা যায় রাজনারায়ণ বসু ও কেশবচন্দ্র সেনের সময়ে। রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্মকে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিক রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন, অন্যদিকে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্মকে একটি আরও সার্বজনীন ও বিশ্বধর্মীয় আদর্শের দিকে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন। এই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে মতভেদ ও বিতর্ক সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীকালে সংগঠনের অভ্যন্তরীণ বিভাজনের পথ প্রশস্ত করে।[৪]

অতএব, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস কেবল ধর্মীয় সংস্কারের ইতিহাস নয়; এটি উনিশ শতকের বাংলার বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ইতিহাসও বটে। এই প্রবন্ধে বিশেষভাবে রাজনারায়ণ বসু ও কেশবচন্দ্র সেনের চিন্তা ও কর্মের আলোকে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরীণ মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব ও ধর্মীয় রূপান্তরের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হবে।

সাহিত্য পর্যালোচনা:

উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণ, ব্রাহ্মসমাজের বিকাশ এবং রাজনারায়ণ বসুর চিন্তাধারা নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও গবেষক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এই গবেষণাগুলি মূলত ব্রাহ্ম আন্দোলনের ধর্মীয়, সামাজিক ও বৌদ্ধিক প্রভাব বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে।

প্রথমত, শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রামধনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' এ উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবর্তনের একটি বিস্তৃত চিত্র তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থে ব্রাহ্মসমাজের বিকাশ, ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ধারা এবং রাজনারায়ণ বসুর কার্যকলাপ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষত ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরীণ মতভেদ ও কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে আদিব্রাহ্ম সমাজের মতপার্থক্যের বিষয়টি তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।[৫]

দ্বিতীয়ত, অমিয় কুমার সেন তাঁর 'The Tattvabodhini Sabha and the Bengal Renaissance' গ্রন্থে তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমে উনিশ শতকের বৌদ্ধিক নবজাগরণের বিকাশ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে এই আন্দোলন পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি নতুন ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারার জন্ম দেয়।[৬]

তৃতীয়ত, সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জী তাঁর 'Social Implications of the Brahmo Movement' গ্রন্থে ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে শিক্ষা বিস্তার, নারী-উন্নয়ন, বিধবাবিবাহ এবং বিবাহসংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বিশেষত ব্রাহ্মবিবাহ আইন সংক্রান্ত বিতর্কের সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।[৭]

এছাড়া ডেভিড কফ তাঁর 'The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind' গ্রন্থে ব্রাহ্মসমাজকে আধুনিক ভারতীয় চিন্তার বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে ব্রাহ্ম আন্দোলন আধুনিক শিক্ষা, ধর্মীয় উদারতা এবং যুক্তিবাদী চিন্তার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[৮]

অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় রাজনারায়ণ বসুর লেখনী ও চিন্তাধারার উচ্চ প্রশংসা করেন। তাঁর মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে রাজনারায়ণ বসুর বক্তব্য সমকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।[৯]

উপরোক্ত গবেষণাগুলি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস, ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন এবং বঙ্গীয় নবজাগরণের বৌদ্ধিক পটভূমি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করলেও, রাজনারায়ণ বসুর চিন্তাধারা ও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গভীর বিশ্লেষণ তুলনামূলকভাবে সীমিত। বিশেষত ব্রাহ্মসমাজের মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব, ব্রাহ্মবিবাহ আইন নিয়ে তাঁর অবস্থান এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনার একটি সমন্বিত গবেষণা এখনও পর্যাপ্তভাবে আলোচিত হয়নি। ফলে এই বিষয়টি নিয়ে আরও গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে।

গবেষণার ফাঁক:

ব্রাহ্মসমাজ এবং উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণ নিয়ে বহু ঐতিহাসিক ও গবেষক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। বিশেষত শিবনাথ শাস্ত্রী, এস. এন মুখার্জী এবং ডেভিড কফ- এর গবেষণায় ব্রাহ্মসমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষিত হয়েছে। তবে এই গবেষণাগুলির অধিকাংশই ব্রাহ্মসমাজকে একটি সামগ্রিক ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন হিসেবে আলোচনা করেছে; সেখানে রাজনারায়ণ বসুর ব্যক্তিগত চিন্তাধারা ও অবদানের উপর স্বতন্ত্র ও গভীর বিশ্লেষণ তুলনামূলকভাবে সীমিত।

প্রথমত, ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরীণ মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব— বিশেষত আদি ব্রাহ্মসমাজ ও কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীন নবব্রাহ্ম ধারার মধ্যে যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল— তার বিশদ বিশ্লেষণে রাজনারায়ণ বসুর ভূমিকা পর্যাপ্তভাবে আলোচিত হয়নি।

দ্বিতীয়ত, ব্রাহ্মবিবাহ আইন (১৮৭২) প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর সমালোচনা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক জাতীয়তাবাদী চিন্তার সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত ছিল, সে বিষয়ে গবেষণা তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে।

তৃতীয়ত, মেদিনীপুরে তাঁর কর্মকাণ্ড— যেমন ব্রাহ্মসমাজের পুনরুজ্জীবন, ধর্মীয় বক্তৃতা, সামাজিক সংস্কারমূলক উদ্যোগ এবং স্থানীয় সমাজে ব্রাহ্ম আদর্শের বিস্তার— এই বিষয়গুলি প্রায়শই সামগ্রিক ব্রাহ্ম আন্দোলনের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে; এগুলির স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা এখনও অপর্যাপ্ত।

চতুর্থত, রাজনারায়ণ বসুর চিন্তাধারায় পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ, খ্রিষ্টীয় ও ইসলামিক একেশ্বরবাদ এবং ভারতীয় বেদান্তীয় দর্শনের যে সমন্বয় দেখা যায়, তার গভীর বৌদ্ধিক বিশ্লেষণও এখনও যথেষ্টভাবে সম্পন্ন হয়নি।
অতএব বলা যায়, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে রাজনারায়ণ বসুর অবদান, তাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনের ভেতরে তাঁর ভূমিকার একটি সমন্বিত ও বিশ্লেষণধর্মী গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান গবেষণা সেই শূন্যস্থান পূরণের একটি প্রচেষ্টা।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

রাজনারায়ণ বসু উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণ ও ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ ও সমাজসংস্কারক। তাঁর চিন্তাধারা, কর্মকাণ্ড এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ:

১. উনিশ শতকের বাংলায় ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিকাশ বিশ্লেষণ করা।
২. ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর সম্পর্ক এবং তাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা।
৩. ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরীণ মতাদর্শগত বিতর্ক ও বিভাজনের প্রেক্ষাপটে রাজনারায়ণ বসুর ভূমিকা বিশ্লেষণ করা।
৪. মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুর ধর্মীয় প্রচার, সামাজিক সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড এবং ব্রাহ্ম আদর্শ প্রচারের গুরুত্ব মূল্যায়ন করা।
৫. ব্রাহ্মবিবাহ আইন ও ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে রাজনারায়ণ বসুর মতামত ও তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা।
৬. উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজে ধর্মীয় সংস্কার, জাতীয় চেতনা এবং সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে রাজনারায়ণ বসুর অবদান নিরূপণ করা।
৭. ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমে একেশ্বরবাদী ধর্মীয় চিন্তা ও সামাজিক সংস্কারের যে ধারা গড়ে ওঠে, তার সঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর চিন্তাধারার সম্পর্ক নির্ধারণ করা।

গবেষণার মূখ্য প্রশ্নাবলী:

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো উনিশ শতকের বঙ্গীয় সমাজে ব্রাহ্মসমাজ ও রাজনারায়ণ বসুর ভূমিকা বিশ্লেষণ করা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিম্নলিখিত মূখ্য প্রশ্নাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে:

১. রাজনারায়ণ বসু কিভাবে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ও ধর্মীয় চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করেছিলেন, এবং তাঁর এই চিন্তাধারা কিভাবে প্রভাব ফেলেছে?
২. মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুর কার্যক্রম, বক্তৃতা ও রচনা কিভাবে ব্রাহ্মসমাজের পুনঃস্থাপনা ও সম্প্রসারণে অবদান রেখেছিল?
৩. ব্রাহ্মবিবাহ আইন এবং ব্রাহ্মধর্মের সম্পর্কিত বিতর্কে রাজনারায়ণ বসুর অভিমত ও কার্যক্রম কী ছিল, এবং তা সমাজে কেমন প্রভাব ফেলেছিল?
৪. রাজনারায়ণ বসুর ব্রাহ্মধর্ম সংক্রান্ত লিখিত রচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি কিভাবে হিন্দুধর্মের সংস্কারমূলক ধারণা প্রচার করেছেন?
৫. ব্রাহ্মসমাজের ভেতরের মতবিরোধ ও কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীন নবগোষ্ঠীর উদ্ভবের প্রেক্ষাপটে রাজনারায়ণ বসুর অবস্থান ও প্রতিক্রিয়া কী ছিল?
৬. রাজনারায়ণ বসুর চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও জাতীয় পুনর্জাগরণের যে প্রভাব পড়েছে, তা কীভাবে পরিমাপ করা যায়?

গবেষণা পদ্ধতি:

এই গবেষণায় গুণগত ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মূলত রাজনারায়ণ বসুর গ্রন্থ, বক্তৃতা, চিঠিপত্র ও ব্রাহ্মসমাজের নথি বিশ্লেষণ করে তাঁর চিন্তাধারা, কার্যক্রম এবং সামাজিক প্রভাব বোঝার চেষ্টা করা

হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে রাজনারায়ণ বসুর লেখা যেমন 'Defence of Brahmoism and the Brahmosamaj', 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা', এবং মাধ্যমিক উৎস হিসেবে শিবনাথ শাস্ত্রী, এস.এন. মুখার্জী ও এ.কে. সেনের গবেষণামূলক সাহিত্য। এছাড়াও তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং নিরীক্ষণ ও ব্যাখ্যা প্রয়োগ করে ব্রাহ্মসমাজের দুটি গোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থান ও হিন্দুধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সংক্ষেপে, গবেষণা পদ্ধতি প্রধানত প্রামাণ্য দলিল ও ঐতিহাসিক তথ্যের বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

সুপ্রাচীনকাল হতে আদ্যাবধি খ্রিস্টীয় বা ইসলামীয় ধাঁচের কেন্দ্রীভূত সুসংবদ্ধ ধর্মপ্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে কখনও গড়ে ওঠেনি। ভারতবর্ষীয় মানুষের ধর্মাচরণকে পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তাই অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হতে পারে। ভারতীয়দের ধর্মাচরণের মূল তার সুদীর্ঘ প্রবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যেই প্রোথিত।[১০] অঞ্চল ও স্থানভেদে বিশ্বাস, উপাসনা ও ধর্মীয় যাপনের পদ্ধতিও ভিন্নতর রূপ ধারণ করেছে। যদিও কখনও এই সাংস্কৃতিক যাপন পদ্ধতির ক্রমাগত জটিলতর রূপের বিরুদ্ধে ভারতীয় সমাজের ভেতর থেকেই প্রতিবাদ ও সংস্কারের ধারা দেখা গেছে, তবে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশজ উপাদানের মধ্য থেকেই সংস্কারমূলক রূপে আবির্ভূত হয়েছে। মূল কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন সাধারণত ঘটেনি; পরিবর্তন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল বাহ্যিক।[১১]

উদাহরণস্বরূপ প্রায় ২৬০০ বছর পূর্বে উদ্ভূত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মীয় আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই আন্দোলনগুলি প্রচলিত ধর্মীয় আচার ও সামাজিক প্রথার সমালোচনা করলেও মূলত ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার ভেতর থেকেই বিকশিত হয়েছিল।[১২] অনেক পণ্ডিতের মতে, এদের দর্শন উপনিষদীয় চিন্তার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়; বরং বৃহত্তর ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যেরই এক বিকল্প ব্যাখ্যা।[১৩]

এইভাবে হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন উত্থান-পতন ঘটেছে, তবু এর মূল বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত থেকেছে। বহিরাগত জাতি যেমন শক, হূণ, পল্লব ও কুষাণ প্রভৃতিও ক্রমে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তিমূলক কাঠামোর মধ্যে আত্মসাৎ হয়ে যায়।[১৪] ফলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি তার দীর্ঘ অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্র বজায় রেখেই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে।[১৫]

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ব্রিটিশরা যেমন ভারতীয়দের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য কেড়ে নিয়েছিল, তেমনি বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তাদের উপনিবেশায়িত করার চেষ্টা করেছিল। ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও পাশ্চাত্য লেখকরা বারবার ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সমালোচনা করে ভারতীয় সমাজের অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরেছিল।[১৬] এই প্রেক্ষাপটে খ্রিস্টীয় মিশনারিদের ভারতবর্ষে ধর্মপ্রচারের সুযোগ দেওয়া হয় এবং তারা সক্রিয়ভাবে ধর্মান্তরকরণের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।[১৭] এই আগ্রাসী ধর্মপ্রচার ও সাংস্কৃতিক সমালোচনার মুখে ব্রাহ্ম আন্দোলন একপ্রকার প্রতিরোধী আদর্শ হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং উনিশ শতকের অনেক শিক্ষিত হিন্দুকে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[১৮]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দুসমাজে ক্রমবর্ধমান কুসংস্কার ও সামাজিক কুপ্রথা— যেমন বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রথা, নারীশিক্ষার প্রতি অনীহা, জাতিভেদ ও বর্ণভেদ— ভারতীয় সমাজের আর্থসামাজিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করেছিল। একই সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও খ্রিস্টীয় ভাবধারার প্রভাবে নবশিক্ষিত বাঙালি সমাজের একাংশের মধ্যে নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে হীনম্মন্যতার অনুভূতি জন্ম নিতে শুরু করে। এই

পরিস্থিতিতে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব ভারতে নবজাগরণের সূচনা ঘটায়। তিনি খ্রিস্টান মিশনারিদের সমালোচনা, ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর ধর্মবিরোধী মনোভাব এবং রক্ষণশীল হিন্দুদের পরিবর্তনবিমুখতার মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহণ করে দেশীয় ঐতিহ্যের সারমর্মের উপর ভিত্তি করে ধর্ম ও সমাজসংস্কারের পথ অনুসরণ করেন এবং ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেন। শ্যামল সেনগুপ্তের মতে, স্বদেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়নই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।[১৯]

শিবনাথ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন যে, রামমোহনের কর্মধারা মূলত সংস্কারমূলক ছিল।[২০] বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের মূল তত্ত্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে রামমোহন উপলব্ধি করেছিলেন যে সকল ধর্মের মধ্যেই এক ও অদ্বিতীয় সত্যের উপাসনার ধারণা বিদ্যমান। তাঁর উদ্যোগেই ব্রাহ্মসমাজে দেশীয় উপাসনা-পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয় এবং সতীদাহ প্রথা রদসহ নানা সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা ব্যবহার করেন। তিনি মনে করতেন যে দেশীয় ধর্মীয় সংস্কৃতির সবকিছুই অগ্রাহ্য করার মতো নয়; বরং পৌত্তলিকতা ও যুক্তিহীন আচারপ্রথাই মানুষের যুক্তিবাদী চিন্তাকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই তিনি হিন্দুসমাজকে সরাসরি আক্রমণ না করে যুক্তি ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে কুসংস্কারের বিরোধিতা করেছিলেন।

অমলশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, রামমোহনের ধর্মচিন্তায় ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সাধনা ও সমবেত উপাসনা— এই দুই দিকের সমন্বয় ছিল। তাঁর মতে ব্যক্তিগত সাধনার ভিত্তি ছিল অদ্বৈতবাদ, আর সমবেত উপাসনার মূল লক্ষ্য ছিল মানবকল্যাণ ও নৈতিক উন্নতি।[২১] অতএব বলা যায় যে রামমোহনের ব্রাহ্ম ভাবনার মূল ভিত্তি ছিল প্রাচীন উপনিষদীয় দর্শন, যা আধুনিক যুক্তিবাদী ব্যাখ্যার মাধ্যমে নতুন রূপ লাভ করেছিল।

১৮৪৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। এর পূর্বে তিনি ১৮৪০ সালে কলকাতায় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টীয় মিশনারিদের সমালোচনার মুখে ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও গৌরবময় ইতিহাসকে নতুনভাবে উপস্থাপন করা।[২২] ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পর দেবেন্দ্রনাথ বেদপাঠকে সকল বর্ণের মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং ধর্মীয় জ্ঞানচর্চাকে আরও বিস্তৃত সামাজিক পরিসরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।[২৩]

১৮৪৫ সালে তিনি এমন বিধান প্রবর্তন করেন যে যারা পৌত্তলিকতা বর্জন করে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী, তারাই ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের অধিকার লাভ করবে। এর মাধ্যমে তিনি একদিকে হিন্দু আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করেন, অন্যদিকে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী চিন্তার সঙ্গে তার এক প্রকার সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ নেন।[২৪] দেবেন্দ্রনাথ মূলত ব্রাহ্ম আদর্শকে হিন্দুধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক কোনো ধর্মরূপে কল্পনা করেননি। তাঁর মতে, হিন্দুধর্ম থেকে পৌত্তলিকতা ও বহু ঈশ্বরবাদ দূর করা গেলে তার প্রকৃত রূপই ব্রাহ্ম আদর্শ হিসেবে প্রতিভাত হয়। তিনি বেদান্ত দর্শনের উপর গভীর আস্থা রাখতেন; তবে রাজা রামমোহন রায়ের অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যার পরিবর্তে তিনি বিশিষ্টাদ্বৈত ভাবধারার প্রতি অধিক ঝোঁক প্রদর্শন করেছিলেন।[২৫]

সমকালীন যুগে আবির্ভূত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম অগ্রদূত হিসেবে পরিচিত রাজনারায়ণ বসু এই একই ধারার চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি আজীবন ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শুদ্ধ ও গৌরবময় দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে দ্বিধা ও হীনম্মন্যতায় ভোগা নবশিক্ষিত যুবসমাজের মানসিক সংকট দূরীকরণে নিজেকে নিয়োজিত করেন।[২৬]

অতএব ব্রাহ্মসমাজে রাজনারায়ণ বসুর ভূমিকা, তাঁর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা এবং অন্যান্য ব্রাহ্ম নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতাদর্শিক পার্থক্যের তুলনামূলক আলোচনা এই প্রবন্ধের মূল বিষয়। এই আলোচনায়

প্রবেশের পূর্বে ব্রাহ্মসমাজের সূচনাপর্বে সংশ্লিষ্ট প্রধান ব্যক্তিত্বদের ভাবধারা এবং ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

রাজনারায়ণ বসু: প্রারম্ভিক জীবন ও বৌদ্ধিক বিকাশ:

উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক, আধ্যাত্মিক, সাহিত্যিক ও বৌদ্ধিক ইতিহাসে রাজনারায়ধ একটি বিশিষ্ট নাম। তিনি ছিলেন উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ ও সমাজসংস্কারক। তাঁর পিতা নন্দকিশোর বসু ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও অনুগামী।[২৭] নন্দকিশোর বসুর প্রথম পুত্র রাজনারায়ণ বসুর জন্ম ১৮২৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বর চব্বিশ পরগনার বোড়াল গ্রামে।[২৮]

প্রথানুসারে তাঁর বাল্যশিক্ষা শুরু হয় গ্রাম্য পাঠশালায়। সেখান থেকে প্রায় সাত বছর বয়সে তিনি কলকাতার একটি পাঠশালায় ভর্তি হন। পরবর্তীকালে তিনি বৌবাজারে শম্ভু মাস্টারের বিদ্যালয় এবং ডেভিড হেয়ার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। অবশেষে তিনি ভর্তি হন তৎকালীন বিখ্যাত হিন্দু কলেজে, যা সেই সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল।[২৯]

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এই পরিবেশ তাঁর মানসগঠনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর মধ্যে সাহিত্য ও ইতিহাসচেতনার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি ইংরেজি সাহিত্যের প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ জন্মেছিল।[৩০]

ফলে তিনি একদিকে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, অন্যদিকে পাশ্চাত্য চিন্তার নতুন ধারা ও বৌদ্ধিক প্রবণতাকেও সমালোচনামূলকভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন। এই দ্বৈত অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মজীবনের অন্যতম ভিত্তি হয়ে ওঠে।

উনিশ শতকের বাংলার সমাজজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল যে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নবযুবকদের একাংশ পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিককে আধুনিকতার পরিচয় হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। তাদের মধ্যে মদ্যপানকে আধুনিক সভ্যতার একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করার প্রবণতা দেখা যায় এবং একই সঙ্গে হিন্দুধর্মে নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত কিছু খাদ্যাভ্যাসের প্রতিও অকারণ আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়।[৩১] এই সামাজিক ও মানসিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে রাজনারায়ণ বসু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব এবং প্রচলিত হিন্দুধর্মের নানা কুসংস্কার ও পঙ্কিলতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ১৮৪৬ সালে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

তবে তাঁর এই সিদ্ধান্ত কেবল ব্যক্তিগত বৌদ্ধিক উপলব্ধির ফল ছিল না; পারিবারিক পরিবেশও এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাঁর পিতা নন্দকিশোর বসু বৈদান্তিক ধর্মমতের প্রতি গভীর বিশ্বাস পোষণ করতেন এবং সেই প্রভাব

রাজনারায়ণের মানসগঠনে কার্যকর হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর আত্মজীবনীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি পাওয়া যায়:

> "কলেজ পরিত্যাগের পূর্বে আমি সংশয়বাদী ছিলাম; কিন্তু স্ত্রী ও পিতার মৃত্যু আমাকে প্রকৃতিস্থ করিল। পুনরায় ধর্মে আমার বিশ্বাস হইল; কিন্তু এবার আমার পৈতৃক তত্ত্ববোধিনী সভার প্রচারিত বৈদান্তিক ধর্মে বিশ্বাস হইল।"[৩২]

তবে তাঁর ব্রাহ্ম আদর্শ গ্রহণ কোনো প্রকার গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেওয়া ছিল না। তিনি ধর্মীয় বিশ্বাস ও যুক্তিহীন অনুকরণের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য উপলব্ধি করেছিলেন। তৎকালীন হিন্দুধর্মের পঙ্কিলতা, কুসংস্কার ও যুক্তিহীন আচারের বিরুদ্ধে তিনি সমালোচনামূলক অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর যুক্তিশীল মন এমন এক ধর্মচিন্তার সন্ধান করছিল যা নৈতিক, যুক্তিসংগত এবং হৃদয়গ্রাহী। যদিও তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের মৌলিক

আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের বিরোধিতা করেননি; বরং তাঁর বিরোধিতা ছিল অন্ধ অনুকরণ ও গড্ডালিকা প্রবাহের বিরুদ্ধে।

রাজনারায়ণ বসু বিশ্বাস করতেন যে ধর্মবোধহীন শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না। তাঁর বক্তৃতা ও প্রার্থনায় একটি যুক্তিনির্ভর, পরিশীলিত এবং উপনিষদীয় ব্রহ্মবাদী চিন্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কর্মজীবনের সূচনায় তিনি ব্রাহ্মসমাজকেই তাঁর প্রথম কর্মক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।[৩৩]

তিনি পাশ্চাত্য যুক্তিবাদকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেননি; বরং অন্ধ অনুকরণের বিরোধিতা করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি স্বদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর আস্থা পোষণ করতেন এবং নবশিক্ষিত বাঙালি সমাজকে বারবার সেই ঐতিহ্যের মূল্য উপলব্ধি করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এক ধরনের সমন্বয়ের আদর্শ গ্রহণ করেছিল বলেই তিনি এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।[৩৪]

অতএব বলা যায় যে ব্রাহ্মসমাজে তাঁর যোগদান কোনো গড্ডালিকা প্রবাহের ফল ছিল না। একদিকে পাশ্চাত্যের মোহে অন্ধ হয়ে পড়া ইয়াং বেঙ্গল গোষ্ঠীর দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা, অন্যদিকে খ্রিস্টান মিশনারিদের আগ্রাসী ধর্মপ্রচার এবং অপরদিকে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সংস্কারবিরোধী মনোভাব— এই দ্বিমুখী পরিস্থিতির মধ্যেই রাজনারায়ণ বসু দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজে রাজনারায়ণ বসুর যোগদান ও প্রাথমিক ভূমিকা:

রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেও আজীবন নিজেকে হিন্দু বলেই মনে করতেন। এই ক্ষেত্রে তিনি রাজা রামমোহন রায় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবধারার অনুসারী ছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর মতে ব্রাহ্ম আদর্শ কোনো নতুন ধর্ম নয়; বরং এটি ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর মূল ভিত্তি ছিল বেদান্ত ও উপনিষদে নিহিত একেশ্বরবাদী ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা, যার সঙ্গে আধুনিক যুগোপযোগী যুক্তিবাদী ধারণার সমন্বয় ঘটেছিল। এই সমন্বয়ের মাধ্যমে তৎকালীন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে কুসংস্কার ও পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে যুক্তিবাদী ও বিশ্বজনীন আদর্শের আলোকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে— এমন বিশ্বাস তিনি পোষণ করতেন।[৩৫]

এই কারণেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটি পত্র লেখেন। সেই পত্রে তিনি প্রস্তাব দেন যে হিন্দুশাস্ত্র থেকে নির্বাচিত মূল তত্ত্বসমূহ সংগ্রহ করে একটি সংকলনগ্রন্থ প্রস্তুত করা উচিত। তাঁর মতে এই গ্রন্থের প্রথম অংশে বেদের নির্বাচিত অংশ, দ্বিতীয় অংশে স্মৃতিশাস্ত্রের অংশ এবং তৃতীয় অংশে ইতিহাস, পুরাণ ও তন্ত্র থেকে প্রাসঙ্গিক শ্লোকসমূহ সংকলিত হওয়া উচিত। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুশাস্ত্রের বিশুদ্ধ ও অবিকৃত রূপ জনসমক্ষে উপস্থাপন করা, যাতে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি পুনরায় আস্থা সৃষ্টি হয়।[৩৬]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হন এবং রাজনারায়ণের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করেন। ক্রমে রাজনারায়ণ বসু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে ওঠেন এবং ব্রাহ্ম আদর্শ প্রচারের বিভিন্ন বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ করতে থাকেন। ১৮৪৬ সালে দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে তত্ত্ববোধিনী সভায় অনুবাদক হিসেবে নিযুক্ত করেন।[৩৭]

প্রথমদিকে তাঁকে উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা প্রদান করতেন এবং রাজনারায়ণ সেগুলিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করতেন। এইভাবে কঠোপনিষদ, কেনোপনিষদ, ঈশোপনিষদ, মুন্ডক উপনিষদ এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদ ক্রমান্বয়ে

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়।[৩৮] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনারায়ণের জ্ঞান ও ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় দক্ষতা দেখে গভীরভাবে মুগ্ধ হন এবং ক্রমে তিনি তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহচর হয়ে ওঠেন।

এইভাবে নিজ প্রতিভা ও দক্ষতার মাধ্যমে ব্রাহ্মসমাজে রাজনারায়ণ বসুর ক্রমশ উত্থান ঘটে। দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশে তিনি বিভিন্ন স্থানে ধর্ম ও সমাজসংস্কার বিষয়ক বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। তাঁর বক্তৃতা ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। যদিও প্রাথমিকভাবে অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর বক্তৃতাশৈলী সম্পর্কে খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের কাছে কয়েকবার অভিযোগও করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজনারায়ণের বক্তৃতার গভীরতা উপলব্ধি করে তিনি তাঁর প্রশংসা করেন। ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ সম্পর্কিত রাজনারায়ণের একটি বক্তৃতা পড়ে অক্ষয়কুমার দত্ত মন্তব্য করেছিলেন— "আপনি মেদিনীপুর উজ্জ্বল করিয়া আছেন।"[৩৯]

১৮৪৬ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বর্ধমান অঞ্চলে গমন করেন। সেখানে তাঁদের ধর্মীয় বক্তৃতা ও আলোচনার মাধ্যমে ব্রাহ্ম আদর্শ প্রচারিত হতে থাকে। বর্ধমানের প্রভাবশালী জমিদার মাহাতাব চাঁদ বাহাদুর রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে ব্রাহ্ম আদর্শ গ্রহণ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বর্ধমানে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।[৪০]

উক্ত সময়ে ব্রাহ্মধর্ম মূলত বৈদান্তিক ধর্মরূপেই পরিচিত ছিল এবং এর ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল উপনিষদীয় একেশ্বরবাদ। তবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতার মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কিত একটি জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কিছু বিশিষ্ট ব্রাহ্ম সদস্য, বিশেষত কৈলাস চন্দ্র দাস মত প্রকাশ করেন যে, দেবেন্দ্রনাথ যদি তাঁর পিতার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে অপৌত্তলিক ব্রাহ্মপদ্ধতিতে সম্পন্ন না করেন, তবে তাঁরা ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করতে বাধ্য হবেন।[৪১]

এই পরিস্থিতিতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে প্রচলিত হিন্দু আচার অনুসারে পিণ্ডদান না করে কেবল দানোৎসর্গ করেন, যা সম্পূর্ণ ব্রাহ্ম প্রথা না হলেও আংশিকভাবে নতুন ধর্মীয় আদর্শের প্রতিফলন ঘটায়। তৎকালীন হিন্দুসমাজের সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এটি একটি সাহসী পদক্ষেপ হিসেবেই বিবেচিত হয়। তবুও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরে মতভেদ ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়।[৪২]

এই বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমালোচনা শুরু করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় রাজনারায়ণ বসু দেবেন্দ্রনাথের সমর্থনে 'ইংলিশম্যান' এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর লেখাগুলিতে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মীয় অবস্থান ও ব্রাহ্ম আদর্শের যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়। এই ঘটনাগুলি ব্রাহ্মসমাজে রাজনারায়ণ বসুর বৌদ্ধিক সক্রিয়তা এবং তাঁর নেতৃত্বের সম্ভাবনাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।[৪৩]

ব্রাহ্মসমাজে বেদের ঐশী প্রামাণ্যতা নিয়ে বিতর্ক (১৮৪৮–১৮৫১):

এসময় (১৮৪৮–১৮৫০) বেদ ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট কিনা, এই বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসুসহ অনেক ব্রাহ্মনেতা প্রথমদিকে বেদকে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলে মনে করতেন। রাজনারায়ণ বসু কেন বেদকে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন, তা তাঁর 'Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।[৪৪]

১৮৪৬ সালের অক্টোবর মাসে 'The Englishman' পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও উল্লেখ করেন যে ধর্মের নীতিসমূহ প্রকৃতি, মানববুদ্ধি ও মানবহৃদয়ের নির্দেশনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত।[৪৫]

অন্যদিকে খ্রিস্টান মিশনারি চিন্তাবিদ জন মুর মুলেনস তাঁর 'Essay on Vedantism, Brahmoism and Christianity' গ্রন্থে মন্তব্য করেন যে ব্রাহ্মরা বেদকে ঐশী সত্যের প্রকাশ হিসেবে মানলেও তারা মূলত প্রকৃতি থেকেই ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করে এবং বেদের শিক্ষাকে সেই প্রাকৃতিক সত্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলেই গ্রহণ করে।[৪৬] রাজনারায়ণ বসুও তাঁর 'Vedantic Doctrine Vindicated' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে অনুপ্রেরণার উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান চিরন্তন সত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তা মানববুদ্ধিকে সমৃদ্ধ করে।[৪৭] তবে বেদের সম্পূর্ণ অভ্রান্ততার প্রশ্নে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরে মতভেদ দেখা দেয়। ব্রাহ্মনেতা অক্ষয়কুমার দত্ত এই মতের বিরোধিতা করেন এবং যুক্তির ভিত্তিতে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানান। দীর্ঘ আলোচনা ও গবেষণার পর ১৮৫১ সালের ২৩ জানুয়ারি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মতিক্রমে বেদের অভ্রান্ততার ধারণা আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যক্ত হয় এবং মানবের আত্মপ্রত্যয়, যুক্তি ও নৈতিক বোধকে ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই পরিবর্তনের প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন যে ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মীয় বিশ্বাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে এবং এই রূপান্তরে রাজনারায়ণ বসুরও ভূমিকা ছিল।[৪৮]

১৮৪৮ থেকে ১৮৫১ সালের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, যার কেন্দ্রে ছিল বেদের প্রামাণ্যতা নিয়ে বিতর্ক। প্রথমদিকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসুসহ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ বেদকে ঈশ্বরপ্রদত্ত বা প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তবে তাঁদের এই গ্রহণ মূলত ঐতিহ্যগত ধর্মবিশ্বাসের উপর নয়, বরং বেদের নৈতিক শিক্ষা ও দার্শনিক যুক্তিসংগততার উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রাহ্মসমাজের নেতারা মনে করতেন যে বেদের উপদেশ যদি মানববুদ্ধি, নৈতিকতা এবং প্রকৃতির সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে তাকে ধর্মীয় সত্যের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

কিন্তু খ্রিস্টান মিশনারিদের সমালোচনা এবং যুক্তিবাদী ব্রাহ্ম চিন্তাবিদদের প্রশ্নের ফলে এই অবস্থান পুনর্বিবেচনার মুখে পড়ে। বিশেষত অক্ষয়কুমার দত্ত যুক্তির ভিত্তিতে বেদের অভ্রান্ততার ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেন। এর ফলে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একটি বৌদ্ধিক অনুসন্ধানের সূচনা হয়, যেখানে ধর্মীয় সত্যের উৎস হিসেবে শাস্ত্রের পরিবর্তে যুক্তি, নৈতিক বোধ এবং ব্যক্তিগত আত্মপ্রত্যয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত এই বিতর্কের ফলস্বরূপ ব্রাহ্মসমাজ বেদের অভ্রান্ততার দাবি পরিত্যাগ করে এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে সার্বজনীন যুক্তিবাদ ও মানবিক নৈতিকতাকে প্রতিষ্ঠা করে। এই রূপান্তর ব্রাহ্মসমাজকে এক নতুন ধর্মদর্শনের দিকে পরিচালিত করে, যা আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মধ্যে এক সৃজনশীল সমন্বয়ের প্রতিফলন।

মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুর কর্মজীবন ও ব্রাহ্মসমাজের প্রসার (১৮৫১–১৮৬৬):

১৮৫১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং প্রায় পনেরো বছর সেখানে কর্মরত ছিলেন। এই সময়ে তিনি শিক্ষা, সমাজসংস্কার ও ধর্মীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।[৪৯] তাঁর উদ্যোগে ১৮৫২ সালে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ পুনরুজ্জীবিত হয়, যা প্রথমে ১৮৪১ সালে শিবচন্দ্র দেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল।[৫০]

রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে একটি ধর্মালোচনা সভা ও সঙ্গতসভা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রভাবে স্থানীয় জমিদার নবীনচন্দ্র নাগ, অখিলচন্দ্র দত্ত এবং নীলকমল দে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন এবং মেদিনীপুর অঞ্চলে ব্রাহ্ম আদর্শের বিস্তার ঘটে।[৫১]

১৮৫৩ সালে তিনি 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা' গ্রন্থ রচনা করেন, যেখানে ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্বসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়। এই গ্রন্থে পশ্চিমী যুক্তিবাদ ও স্বদেশীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার এক সমন্বিত রূপ প্রকাশ পায়।[৫২] পরে তিনি 'ব্রহ্মসাধন' পুস্তিকা রচনা করেন, যার ভাবধারা আংশিকভাবে John Abercrombie-এর 'The Interior Life'

গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এই গ্রন্থ সম্পর্কে কেশবচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছিলেন যে ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্বকে ব্যক্তিগত জীবনে উপলব্ধি না করলে এমন রচনা সম্ভব নয়।[৫৩] মেদিনীপুরে অবস্থানকালে তিনি খ্রিস্টান মিশনারিদের সমালোচনার জবাবে ইংরেজি ভাষায় 'Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj' রচনা করেন, যা ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়।[৫৪] ১৮৬৩ সালে তিনি বঙ্গদেশের প্রথম সুরাপান নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠা করেন, যার লক্ষ্য ছিল মদ্যপান রোধ ও সমাজের নৈতিক ও শারীরিক উন্নতি সাধন।[৫৫]

এইভাবে মেদিনীপুরে তাঁর কর্মজীবন কেবল শিক্ষা প্রশাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং ধর্মীয় পুনর্জাগরণ, সামাজিক সংস্কার এবং বৌদ্ধিক নেতৃত্বের মাধ্যমে তিনি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শকে সুদূরপ্রসারী রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

মেদিনীপুরে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও সামাজিক সংস্কারে রাজনারায়ণ বসুর ভূমিকা:

মেদিনীপুরে অবস্থানকালে রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যে উদ্দেশ্যমূলক বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন, সেগুলি পরে মুদ্রিত হয়ে সারাদেশে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে তাঁর মেদিনীপুরে প্রদত্ত উপদেশাবলী পাঠ করেই কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন এবং পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।[৫৬] মেদিনীপুরে প্রতিষ্ঠিত সুরাপান নিবারণী সভাও একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উদ্যোগ ছিল। এই আন্দোলনের প্রভাবেই ১৮৬৪ সালে প্যারীচরন সরকার কলকাতায় একই আদর্শে একটি সুরাপান নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠা করেন।[৫৭]

রাজনারায়ণ বসু কেবল ব্রাহ্মধর্ম প্রচারেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না; তিনি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনেও ব্রাহ্ম আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। ব্রাহ্মনীতির প্রতি তাঁর এই অঙ্গীকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হল নিজের কন্যার বিবাহ ব্রাহ্মপদ্ধতিতে সম্পন্ন করা।[৫৮] এছাড়াও মেদিনীপুরে অবস্থানকালে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং এর মাধ্যমে এই সামাজিক সংস্কার আন্দোলন গ্রামীণ বাংলায় বিস্তার লাভ করে। প্রবল সামাজিক প্রতিরোধ সত্ত্বেও তিনি বিদ্যাসাগরের পাশে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করেন এবং বিদ্যাসাগরের পুত্র দুর্গানারায়ণ ও সহোদর মদনমোহনের বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন।[৫৯]

এইসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্মের আদর্শকে কেবল ধর্মীয় তত্ত্বের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং সমাজসংস্কার ও ব্যক্তিজীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন।

মেদিনীপুরে অবস্থানকালে রাজনারায়ণ বসু যে কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন, তা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় নির্দেশ করে। এই সময়ে তাঁর বক্তৃতা, রচনা এবং সামাজিক উদ্যোগ ব্রাহ্ম আন্দোলনকে কেবল শহরকেন্দ্রিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখেনি; বরং তা বাংলার জেলা ও গ্রামীণ সমাজেও বিস্তার লাভ করতে সহায়তা করে। মেদিনীপুরে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাসমূহ মুদ্রিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রচারিত হওয়ার ফলে ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজে নতুন আগ্রহের সৃষ্টি হয়। এরই প্রভাবে কেশবচন্দ্র সেনের মতো নবীন চিন্তাবিদ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পরবর্তীকালে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।একইসঙ্গে রাজনারায়ণ বসু ধর্মীয় আদর্শকে সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। সুরাপান নিবারণ আন্দোলন, বিধবাবিবাহের প্রসারে সহায়তা এবং পারিবারিক জীবনে ব্রাহ্মনীতির অনুসরণ তাঁর সংস্কারবাদী মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় দেয়।

বিশেষভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রতি তাঁর সমর্থন ব্রাহ্মসমাজের উদার ও প্রগতিশীল চরিত্রকে আরও সুদৃঢ় করে।

অতএব বলা যায়, মেদিনীপুর পর্বে রাজনারায়ণ বসুর কর্মকাণ্ড ব্রাহ্মসমাজকে কেবল একটি ধর্মীয় মতবাদ হিসেবে নয়, বরং একটি বিস্তৃত সামাজিক ও নৈতিক সংস্কার আন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাঁর এই উদ্যোগ উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণধর্মী চিন্তাধারার বিকাশেও বিশেষ অবদান রেখেছিল।

কানপুর পর্ব ও ব্রাহ্মসমাজে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব:

১৮৬৬ সালে অসুস্থতার কারণে রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর ত্যাগ করে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। কানপুরে অবস্থানকালে কানপুর ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সেখানে তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে ব্রাহ্মধর্ম কোনো নতুন ধর্ম নয়; বরং এটি হিন্দুধর্মের প্রাচীন ও বিশুদ্ধ রূপের পুনরাবিষ্কার। তাঁর মতে, হিন্দুধর্মের উপর যে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার আবরণ পড়েছিল, ব্রাহ্মধর্ম সেই আবরণ দূর করে ধর্মের মূল সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়।[৬০] এই মতবাদ থেকেই পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের মতবিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে। কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে কিছু ব্রাহ্ম সদস্য আদি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে অবতারবাদ ও ব্যক্তিপূজার প্রবণতা দেখা দিতে শুরু করে। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন—

> "সেদিন এমন এক দৃশ্য দেখিলাম যাহা আর ব্রাহ্মসমাজে পূর্বে কখনো দেখি নাই। উপাসনার পরে প্রত্যেক ব্রাহ্ম মজুমদার মহাশয়ের পা ধরিয়া কেহ বলিলেন— 'প্রভু আমাকে পরিত্রাণ করুন।' কেহ বলিলেন— 'আমার হয়ে দুটো কথা ঈশ্বরকে বলিবেন।' তাহার পর অপেক্ষাকৃত কম বয়সের ব্রাহ্ম আচার্যের পা ধরা হইল। ব্রাহ্মেরা আমার পা ধরিতে আইলে আমি এমন করিতে নাই, করিতে নাই বলিয়া পিছু হাটিতে লাগিলাম।"[৬১]

এই ঘটনা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নরপূজার প্রবণতার সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়। এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেন—

> "এই ১৮৬৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। নবভক্তির আবির্ভাবে ব্রাহ্মদিগের অন্তরে আশ্চর্য্য বিনয়ের আবির্ভাব হয়। তাহার ফলস্বরূপ তাহাদের অনেকে কেশবচন্দ্রের পদে ধরিয়া পদধূলি গ্রহণ, পাদপ্রক্ষালন, সবিনয়ে ক্রন্দন প্রভৃতি আরম্ভ করেন।"[৬২]

এই প্রবণতার বিরোধিতা করে রাজনারায়ণ বসু ১৮৬৯ সালে 'Brahmic Advice, Caution and Help' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। সেখানে তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে ব্রাহ্মধর্মের মূল লক্ষ্য হল নিরাকার পরমব্রহ্মের উপাসনা প্রতিষ্ঠা করা এবং সকল প্রকার মূর্তিপূজা ও অবতারবাদ পরিহার করা।[৬৩]

পরবর্তীকালে ১৮৭২ সালে ব্রাহ্মবিবাহ আইন প্রণয়ন প্রসঙ্গেও মতভেদ তীব্র হয়ে ওঠে। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে পৃথক ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু এর বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটি সংস্কারমূলক রূপ এবং সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে হিন্দু সমাজকে শুদ্ধ করা উচিত।[৬৪]

ব্রাহ্মবিবাহ আইন প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর সমালোচনা:

ব্রাহ্মবিবাহ আইন নিয়ে বিতর্কের সময় রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের উদ্দেশ্যে 'An Appeal to the Brahmos of India' শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র রচনা করেন। এই পত্রে তিনি আইনটির বিরোধিতা করে যুক্তি দেন যে, প্রস্তাবিত ব্রাহ্মবিবাহ বিল ব্রাহ্মধর্মের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য ও আচারব্যবস্থাকে অবমূল্যায়ন করছে। তাঁর মতে, আইনটি বিবাহকে রেজিস্ট্রারের সামনে সম্পাদিত একটি নাগরিক আনুষ্ঠানিকতার উপর নির্ভরশীল করে তুলছে, ফলে ব্রাহ্মীয় ধর্মীয় আচারকে গৌণ বা অপ্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন—

> "The bill in question imposes a new form of marriage in the presence of the registrar… What are Brahmic nuptial rites—nothing, and the form of marriage imposed by the legislature everything? Is not this a plain insult to our religion?"[৬৫]

রাজনারায়ণ বসুর মতে, এই বিল কার্যকর হলে প্রথমবারের মতো ঔপনিবেশিক সরকার কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করবে। তিনি সতর্ক করে দেন যে, ব্রাহ্মসমাজ যদি স্বেচ্ছায় তাদের ধর্মীয় অধিকারের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয়, তবে ভবিষ্যতে ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে বারবার সরকারি হস্তক্ষেপের পথ উন্মুক্ত হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

> "For the first time in the history of India the Government is going to interfere with the religion of a class of Her Majesty's Indian subjects… Better that our sons be deprived of their patrimonial inheritance than that we should part with our religious independence."[৬৬]

এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের সংস্কারমূলক রূপ হিসেবে দেখলেও তিনি ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন। তাঁর মতে, ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারমূলক আদর্শ বজায় রাখতে হলে রাষ্ট্রের আইনি কাঠামোর পরিবর্তে ধর্মীয় আচার ও নৈতিক নীতির উপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ফলে ব্রাহ্মবিবাহ আইনকে কেন্দ্র করে যে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, তা ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরীণ বিভাজনকে আরও প্রকট করে তোলে এবং পরবর্তীকালে আন্দোলনের গতিপথে গভীর প্রভাব ফেলে।

ব্রাহ্মবিবাহ আইন বিতর্ক ও রাজনারায়ণ বসুর জাতীয়তাবাদী অবস্থান:

ব্রাহ্মবিবাহ আইন প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসু সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতীয় সমাজে বিবাহ কেবল একটি আইনি চুক্তি নয়; বরং এটি গভীর আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তাঁর মতে, ব্রাহ্মবিবাহকে কেবলমাত্র রেজিস্ট্রারের সামনে সম্পাদিত নাগরিক আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে বৈধতা দেওয়া হলে তার ধর্মীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। তদুপরি তিনি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিদেশি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন, কারণ এর ফলে ভারতীয় সমাজ ধীরে ধীরে ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে সাংস্কৃতিকভাবে উপনিবেশায়িত হয়ে পড়তে পারে। তিনি সতর্ক করে দেন যে যদি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্কও ব্রিটিশ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে ভারতীয় সমাজের স্বাতন্ত্র্য ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৬৭]

রাজনারায়ণ বসুর এই যুক্তিনির্ভর ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ বক্তব্য সমসাময়িক সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় রাজনারায়ণ বসুর এই বক্তব্যের প্রশংসা করে লিখেছিলেন—

"রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হউক। এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক; হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক; গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নর্মদা, গোদাবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক।"[৬৮] একইভাবে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে রাজনারায়ণ বসুর এই বক্তৃতা ছিল অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও জাতীয় চেতনায় সমৃদ্ধ—

"এই বক্তৃতা এত চিন্তাপূর্ণ, সুযুক্তিসঙ্গত ও জাতীয় ভাবপূর্ণ হইয়াছিল যে বক্তৃতা হইবামাত্র চারিদিকে ধন্য ধন্য রব উঠিয়া গেল।"[৬৯] অন্যদিকে সমসাময়িক সংবাদপত্র 'সোমপ্রকাশ'-এ দ্বারকানাথ বিদ্যা ভূষন মন্তব্য করেছিলেন—

"হিন্দুধর্ম নির্বাণোন্মুখ হইতেছিল, রাজনারায়ণবাবু তাহাকে রক্ষা করিলেন।"[৭০]

তবে এই বিতর্কের ফলশ্রুতিতে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরীণ বিভাজন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী ক্রমশ হিন্দু সমাজ থেকে পৃথক ধর্মীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হয়, অন্যদিকে আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু হিন্দুধর্মের সংস্কার ও একেশ্বরবাদী ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাকে নতুন রূপে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। তবুও উভয় গোষ্ঠীর ধর্মীয় উপাসনা, আচার ও উৎসবের ভক্তিমূলক রূপে হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রভাব স্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল।

বস্তুত, এই বিতর্ক থেকে স্পষ্ট হয় যে উনিশ শতকের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ, খ্রিষ্টীয় ও ইসলামি একেশ্বরবাদী ধারণার প্রভাব গ্রহণ করলেও তারা ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে একটি যুক্তিসম্মত ধর্মদর্শন নির্মাণের চেষ্টা করেছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির দীর্ঘ ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এটি মূলত অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমন্বয়ধর্মী; বিভিন্ন ধর্মীয় ও দার্শনিক ধারাকে গ্রহণ করে বহুত্বের মধ্য দিয়ে এক বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে তোলাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। ফলে ধর্মীয় আগ্রাসনের পরিবর্তে সহাবস্থান ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিকশিত হয়েছে।

গবেষণার প্রধান অনুসিদ্ধান্ত:

১. রাজনারায়ণ বসু উনিশ শতকের ব্রাহ্ম আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধিক ও সাংগঠনিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা ব্রাহ্মধর্মকে যুক্তিবাদী, নৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে।

২. মেদিনীপুরে তাঁর কর্মপর্ব ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। সেখানে তিনি ব্রাহ্মসমাজের পুনরুজ্জীবন, ধর্মীয় বক্তৃতা, গ্রন্থ রচনা এবং বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে আন্দোলনকে নতুন গতি প্রদান করেন।

৩. তাঁর রচিত গ্রন্থ ও বক্তৃতাগুলি ব্রাহ্মধর্মের তাত্ত্বিক ভিত্তি সুসংহত করতে সহায়তা করে এবং শিক্ষিত সমাজে একেশ্বরবাদী ধর্মচিন্তার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব বিশেষত কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে উদ্ভূত নতুন ধারার সঙ্গে তাঁর বিরোধ আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় নির্দেশ করে। রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের সংস্কারমূলক রূপ হিসেবে দেখেছিলেন, যেখানে কেশবচন্দ্র সেন এটিকে পৃথক ধর্মীয় সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী ছিলেন।

৫. ব্রাহ্মবিবাহ আইন প্রসঙ্গে তাঁর বিরোধিতা ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রশ্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নির্দেশ করে। তিনি মনে করতেন যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ভারতীয় সমাজকে সাংস্কৃতিকভাবে উপনিবেশায়িত করার পথ প্রশস্ত করতে পারে।

৬. তাঁর যুক্তিপূর্ণ লেখনী ও বক্তৃতা সমসাময়িক সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ সমসাময়িক চিন্তাবিদ তাঁর বক্তব্যের উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন।

৭. ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও উভয় পক্ষই একেশ্বরবাদী ধর্মচিন্তা এবং ধর্মীয় সংস্কারের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিল, যা উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

৮. সামগ্রিকভাবে দেখা যায় যে রাজনারায়ণ বসুর চিন্তা ও কর্মকাণ্ড ভারতীয় সমাজে ধর্মীয় সংস্কার, জাতীয় চেতনার বিকাশ এবং সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের পুনর্গঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল।

উপসংহার:

উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে রাজনারায়ণ বসুর চিন্তা ও কর্মধারা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছে। তিনি ব্রাহ্মধর্মকে কেবল একটি ধর্মীয় মতবাদ হিসেবে নয়, বরং একটি যুক্তিনির্ভর ও সংস্কারমূলক সামাজিক আন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর রচনা, বক্তৃতা এবং সংগঠনিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ব্রাহ্মসমাজ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে নতুন ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। বিশেষত মেদিনীপুরে তাঁর কার্যকাল ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিস্তারে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে, যেখানে ধর্মীয় প্রচার, সামাজিক সংস্কার এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রম একসঙ্গে অগ্রসর হয়। রাজনারায়ণ বসুর ধর্মীয় চিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দুধর্মের প্রাচীন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে যুক্তিবাদী ব্যাখ্যার মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা। তিনি ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের সংস্কারিত রূপ হিসেবে দেখেছিলেন এবং এর মাধ্যমে পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার ও অযৌক্তিক প্রথাকে পরিহার করে একেশ্বরবাদী ধর্মচেতনার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে ব্রাহ্মসমাজের অন্য একটি প্রভাবশালী ধারার নেতা কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মতাদর্শগত দ্বন্দ্বে নিয়ে যায়। কেশবচন্দ্র সেন যেখানে ব্রাহ্মধর্মকে পৃথক ধর্মীয় সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী ছিলেন, সেখানে রাজনারায়ণ বসু এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুধর্মের সংস্কার ও পুনর্ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন সাধনের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন।

ব্রাহ্মবিবাহ আইন নিয়ে বিতর্কে রাজনারায়ণ বসুর অবস্থান তাঁর ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে গভীর সচেতনতার পরিচয় দেয়। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ভারতীয় সমাজকে ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিকভাবে উপনিবেশায়িত করে তুলতে পারে। এই কারণে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের সতর্ক করে ধর্মীয় অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার আহ্বান জানান। তাঁর এই যুক্তিনির্ভর বক্তব্য সমসাময়িক বুদ্ধিজীবী সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং শিক্ষিত সমাজে তাঁর মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সমসাময়িক সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও চিন্তাবিদ শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর চিন্তাধারার প্রশংসা করেছিলেন, যা তাঁর বৌদ্ধিক প্রভাবের স্বীকৃতি বহন করে।

সর্বোপরি বলা যায়, রাজনারায়ণ বসুর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজে আধুনিকতার বিকাশের সঙ্গে ঐতিহ্যের সমন্বয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। তিনি একদিকে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদী মূল্যবোধকে গ্রহণ করেছিলেন, অন্যদিকে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ভিত্তিকে অক্ষুণ্ণ রেখে একটি নতুন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় নির্মাণের চেষ্টা করেছিলেন। এই কারণেই তাঁর চিন্তা ও কর্মকাণ্ড কেবল ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসেই নয়, সমগ্র বঙ্গীয় নবজাগরণের ধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

তথ্যসূত্র:

১. Kopf, David. The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind. Princeton University Press, Princeton, 1979, pp. 3–10.
২. Sastri, Sivanath, History of the Brahmo Samaj, Sadharan Brahmo Samaj Press, Calcutta, 1911, pp. 45–52.
৩. Tagore, Rabindranath, The Religion of Man, George Allen & Unwin, London, 1931, pp. 23–25.
৪. Ghosh, Baridbaran, Rajnarayan Basu: A Study of His Life and Thought, Firma KLM, Calcutta, 1975, pp. 80–92.
৫. Shastri, Shibnath, Ramtanu Lahiri O Tatkalin Banga Samaj, New Age Publishers, Calcutta, 1904, pp. 210–220.
৬. Sen, Amiya Kumar, The Tattvabodhini Sabha and the Bengal Renaissance, Firma KLM, Calcutta, 1979, pp. 140–160.
৭. Mukherjee, S. N., Social Implications of the Brahmo Movement, Firma KLM, Calcutta, 1974, pp. 350–365.
৮. Kopf, David, The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind, Princeton University Press, Princeton, 1979, pp. 45–60.
৯. Chattopadhyay, Bankim Chandra, “Rajnarayan Babur Lekhani,” Bangadarshan, Chaitra 1279 B.S., p. 312.
১০. Radhakrishnan, Sarvepalli, Indian Philosophy, Vol. 1, George Allen & Unwin, London, 1923, pp. 22–28.
১১. Basham, A. L., The Wonder That Was India, Sidgwick & Jackson, London, 1954, pp. 9–15.
১২. Thapar, Romila, Early India: From the Origins to AD 1300, University of California Press, Berkeley, 2002, pp. 143–152.
১৩. Radhakrishnan, S., Indian Philosophy, Vol. 1, pp. 309–320.
১৪. Majumdar, R. C., Ancient India, Motilal Banarsidass, Delhi, 1977, pp. 215–220.
১৫. Nehru, Jawaharlal, The Discovery of India, Oxford University Press, New Delhi, 1946, pp. 48–55.
১৬. Said, Edward, Orientalism, Pantheon Books, New York, 1978, pp. 205–210.
১৭. Oddie, Geoffrey A., Missionaries, Rebellion and Proto-Nationalism, Curzon Press, Richmond, 1999, pp. 45–50.
১৮. Kopf, David, The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind, Princeton University Press, Princeton, 1979, pp. 31–38.
১৯. Sengupta, Shyamal, Raja Rammohan Roy and the Brahmo Movement, Firma KLM, Kolkata, 1983, pp. 54–60.
২০. Sastri, Sivanath, History of the Brahmo Samaj, Sadharan Brahmo Samaj Press, Calcutta, 1911, pp. 63–65.
২১. Bandyopadhyay, Amal Sankar, Rammohun Roy: A Study of His Religious Thought, Firma KLM, Calcutta, 1964, pp. 112–118.
২২. Kopf, David, The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind, Princeton University Press, Princeton, 1979, pp. 55–60.
২৩. Sastri, Sivanath, History of the Brahmo Samaj, Sadharan Brahmo Samaj Press, Calcutta, 1911, pp. 118–122.
২৪. Sen, Amiya P., Debendranath Tagore, Oxford University Press, New Delhi, 2010, pp. 73–80.
২৫. Sen, Amiya P., Debendranath Tagore, pp. 95–102.
২৬. Basu, Rajnarayan, Atmacharit, Bangiya Sahitya Parishad, Calcutta, 1909, pp. 45–50.
২৭. Basu, Rajnarayan, Atmacharit, pp. 3–5.

২৮. Sen, Amiya P., Hindu Revivalism in Bengal, 1872–1905, Oxford University Press, Delhi, 1993, p. 21.
২৯. Kopf, David, The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind, Princeton University Press, Princeton, 1979, pp. 140–145.
৩০. Sarkar, Sumit, A Critique of Colonial India, Papyrus, Calcutta, 1985, pp. 96–100.
৩১. Sarkar, Sumit, A Critique of Colonial India, pp. 87–92.
৩২. Basu, Rajnarayan, Atmacharit, Bangiya Sahitya Parishad, Calcutta, 1909, p. 32.
৩৩. Kopf, David, The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind, Princeton University Press, Princeton, 1979, pp. 142–148.
৩৪. Sen, Amiya P., Hindu Revivalism in Bengal, 1872–1905, Oxford University Press, Delhi, 1993, pp. 36–40.
৩৫. Basu, Rajnarayan, Atmacharit, pp. 60–65.
৩৬. Ghosh, Baridbaran, Rajnarayan Basu, Sahitya Samsad, Kolkata, 1962, pp. 32–34.
৩৭. Sastri, Sivanath, History of the Brahmo Samaj, Sadharan Brahmo Samaj Press, Calcutta, 1911, pp. 135–138.
৩৮. Kopf, David, The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind, Princeton University Press, Princeton, 1979, pp. 150–155.
৩৯. Ghosh, Baridbaran, Rajnarayan Basu, p. 37.
৪০. Ghosh, Baridbaran, Rajnarayan Basu, Sahitya Samsad, Kolkata, 1962, pp. 40–42.
৪১. Sastri, Sivanath, History of the Brahmo Samaj, Sadharan Brahmo Samaj Press, Calcutta, 1911, pp. 150–152.
৪২. Kopf, David, The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind, Princeton University Press, Princeton, 1979, pp. 158–160.
৪৩. Ghosh, Baridbaran, Rajnarayan Basu, pp. 44–45.
৪৪. Basu, Rajnarayan, Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj, Brahmo Samaj Press, Calcutta, 1860, pp. 12–15.
৪৫. Tagore, Debendranath, “Letter on the Principles of the Brahmo Religion,” The Englishman, Calcutta, October 1846.
৪৬. Mullens, John Muir, Essay on Vedantism, Brahmoism and Christianity, Bishop’s College Press, Calcutta, 1854, pp. 30–33.
৪৭. Basu, Rajnarayan, “Pedantic Doctrine Vindicated,” in Tracts on Brahmoism, Brahmo Samaj Press, Calcutta, 1865, pp. 41–44.
৪৮. Sastri, Sivanath, Ramtanu Lahiri O Tatkalin Bangasamaj, New Age Publishers, Calcutta, 1903, p. 212.
৪৯. Ghosh, Baridbaran, Rajnarayan Basu, Sahitya Samsad, Calcutta, 1962, pp. 58–59.
৫০. Sastri, Sivanath, Ramtanu Lahiri O Tatkalin Bangasamaj, New Age Publishers, Calcutta, 1903, p. 215.
৫১. Ghosh, Baridbaran, Rajnarayan Basu, pp. 60–61.
৫২. Basu, Rajnarayan, Dharmatattva Dipika, Brahmo Samaj Press, Calcutta, 1853, pp. 3–6.
৫৩. Sen, Keshab Chandra, Speeches and Writings of Keshab Chandra Sen, Brahmo Samaj Press, Calcutta, 1870, pp. 84–85.
৫৪. Basu, Rajnarayan, Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj, Brahmo Samaj Press, Calcutta, 1860, pp. 18–22.
৫৫. Kopf, David, The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind, Princeton University Press, Princeton, 1979, pp. 164–165.
৫৬. Sastri, Sivanath, Ramtanu Lahiri O Tatkalin Bangasamaj, New Age Publishers, Calcutta, 1903, pp. 218–219.
৫৭. Ghosh, Baridbaran, Rajnarayan Basu, Sahitya Samsad, Calcutta, 1962, pp. 72–73.
৫৮. Ghosh, Baridbaran, Rajnarayan Basu, p. 74.

৫৯. Vidyasagar, Ishwar Chandra, Bidhaba Bibaha, Sanskrit Press, Calcutta, 1855; see also Sastri, Sivanath, Ramtanu Lahiri O Tatkalin Bangasamaj, p. 220.
৬০. Sen, A. K., The Tattvabodhini Sabha and the Bengal Renaissance, Firma KLM, Calcutta, 1979, p. 154.
৬১. Basu, Rajnarayan, Atmacharit, Bangiya Sahitya Parishad, Calcutta, 1909, p. 92.
৬২. Shastri, Shibnath, Ramtanu Lahiri O Tatkalin Banga Samaj, New Age Publishers, Calcutta, 1904, p. 183.
৬৩. Basu, Rajnarayan, Brahmic Advice, Caution and Help, Calcutta, 1869, pp. 15–16.
৬৪. Mukherjee, S. N., Social Implications of the Brahmo Movement, Firma KLM, Calcutta, 1974, p. 360.
৬৫. Basu, Rajnarayan, An Appeal to the Brahmos of India, Brahmo Press, Calcutta, 1871, p. 5.
৬৬. Basu, Rajnarayan, An Appeal to the Brahmos of India, pp. 6–7.
৬৭. Basu, Rajnarayan, An Appeal to the Brahmos of India, Brahmo Press, Calcutta, 1871, pp. 6–8.
৬৮. Chattopadhyay, Bankim Chandra, “Rajnarayan Babur Lekhani,” Bangadarshan, Chaitra 1279 B.S., p. 312.
৬৯. Shastri, Shibnath, Ramtanu Lahiri O Tatkalin Banga Samaj, New Age Publishers, Calcutta, 1904, p. 215.
৭০. Vidyabhushan, Dwarkanath, “Brahmo Bibaha Bill,” Som Prakash, 1872, cited in Shastri, Shibnath, Ramtanu Lahiri O Tatkalin Banga Samaj, p. 215.